

র বী ন্দ্র না থ ঠা কু র

ঘরে-বাইরে

পরিচ্ছেদ ১

বিমলার আকথা

মা গো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, চওড়া সেই লাল-পেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ-- শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগরেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে ? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মতো ছুটে এল ? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখল না ? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমূহূর্তে সেই-যে উষাসতীর দান, দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার ? আমাদের দেশে তাকেই বলে সুন্দর যার বর্ণ গৌর। কিন্তু যে আকাশ আলো দেয় সে যে নীল। আমার মায়ের বর্ণ ছিল শামলা, তাঁর দীপ্তি ছিল পুণ্যের। তাঁর রূপ রূপের গর্বকে লজ্জা দিত। আমি মায়ের মতো দেখতে এই কথা সকলে বলে। তা নিয়ে ছেলেবেলায় একদিন আয়নার উপর রাগ করেছি। মনে হত আমার সর্বাঙ্গে এ যেন একটা অন্যায়ে-- আমার গায়ের রঙ, এ যেন আমার আসল রঙ নয়, এ যেন আর-কারো জিনিস, একেবারে আগাগোড়া ভুল।

সুন্দরী তো নই, কিন্তু মায়ের মতো যেন সতীর যশ পাই দেবতার কাছে একমনে এই বর চাইতুম। বিবাহের সম্বন্ধ হবার সময় আমার শৃশুরবাড়ি থেকে দৈবজ্ঞ এসে আমার হাত দেখে বলেছিল, এ মেয়েটি সুলক্ষণা সতীলক্ষ্মী হবে। মেয়েরা সবাই বললে, তা হবেই তো, বিমলা যে ওর মায়ের মতো দেখতে। রাজার ঘরে আমার বিয়ে হল। তাঁদের কোন্ কালের বাদশাহের আমলের সম্মান। ছেলেবেলায় রূপকথার রাজপুত্রের কথা শুনেছি, তখন থেকে মনে একটা ছবি আঁকা ছিল। রাজার ঘরের ছেলে, দেহখানি যেন চামেলি ফুলের পাপড়ি দিয়ে গড়া, যুগযুগান্তর যে-সব কুমারী শিবপূজা করে এসেছে তাদেরই একগ্রন্থ মনের কামনা দিয়ে সেই মুখ যেন তিলে তিলে তৈরি। সে কী চোখ, কী নাক ! তরুণ গৌঁফের রেখা ভ্রমরের দুটি ডানার মতো, যেমন কালো, তেমনি কোমল।

স্বামীকে দেখলুম, তার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এমন-কি, তাঁর রঙ দেখলুম আমারই মতো। নিজের রূপের অভাব নিয়ে মনে যে সংকোচ ছিল সেটা কিছু ঘুচল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ল। নিজের জন্যে লজ্জায় না হয় মরেই যেতুম, তবু মনে মনে যে রাজপুত্রটি ছিল তাকে একবার চোখে চোখে দেখতে পেলাম না কেন ?

কিন্তু রূপ যখন চোখের পাহারা এড়িয়ে লুকিয়ে অন্তরে দেখা দেয় সেই বুঝি ভালো। তখন সে যে ভক্তির অমরাবতীতে এসে দাঁড়ায়, সেখানে তাকে কোনো সাজ করে আসতে হয় না। ভক্তির আপন সৌন্দর্যে সমস্তই কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে সে আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। মা যখন বাবার জন্যে বিশেষ করে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে জলখাবার গুছিয়ে দিতেন, বাবার জন্যে পানগুলি বিশেষ করে কেওড়া-জলের-ছিটে-দেওয়া কাপড়ের টুকরোয় আলাদা জড়িয়ে রাখতেন, তিনি খেতে বসলে তালপাতার পাখা নিয়ে আস্তে আস্তে মাছি তাড়িয়ে দিতেন, তাঁর সেই লক্ষ্মীর হাতের আদর, তাঁর সেই হৃদয়ের সুধারসের ধারা কোন্ অপরূপ রূপের সমুদ্রে গিয়ে বাঁপ দিয়ে পড়ত সে যে আমার সেই ছেলেবেলাতেও মনের মধ্যে বুঝতুম।

সেই ভক্তির সুরটি কি আমার মনের মধ্যে ছিল না ? ছিল। তর্ক না, ভালোমন্দের তত্ত্বনির্গয় না, সে কেবলমাত্র একটি সুর ! সমস্ত জীবনকে যদি জীবনবিধাতার মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি স্তবগান করে বাজিয়ে যাবার কোনো সার্থকতা থাকে, তবে সেই প্রভাতের সুরটি আপনার কাজ আরম্ভ করেছিল।

মনে আছে, ভোরের বেলায় উঠে অতি সাবধানে যখন স্বামীর পায়ের ধুলো নিতুম তখন মনে হত আমার সিঁথের সিঁদুরটি যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল। একদিন তিনি হঠাৎ জেগে হেসে উঠে বললেন, ও কি বিমল, করছ কী! আমার সে লজ্জা ভুলতে পারব না। তিনি হয়তো ভাবলেন, আমি লুকিয়ে পুণ্য অর্জন করছি। কিন্তু, নয়, নয়, সে আমার পুণ্য নয়-- সে আমার নারীর হৃদয়, তার ভালোবাসা আপনিই পূজা করতে চায়।

আমার শশুর-পরিবার সাবেক নিয়মে বাঁধা। তার কতক কায়দা-কানুন মোগল-পাঠানের, কতক বিধিবিধান মনু পরাশরের। কিন্তু আমার স্বামী একেবারে একেলে। এ বংশে তিনিই প্রথম রীতিমত লেখাপড়া শেখেন আর এম. এ. পাস করেন। তাঁর বড়ো দুই ভাই মদ খেয়ে অল্প বয়সে মারা গেছেন; তাঁদের ছেলেপুলে নেই। আমার স্বামী মদ খান না, তাঁর চরিত্রে কোনো চঞ্চলতা নেই; এ বংশে এটা এত খাপছাড়া যে সকলে এতটা পছন্দ করে না, মনে করে যাদের ঘরে লক্ষ্মী নেই অত্যন্ত নির্মল হওয়া তাদেরই সাঙ্গে। কলঙ্কের প্রশস্ত জায়গা তারার মধ্যে নেই, চাঁদের মধ্যেই আছে।

বহুকাল হল আমার শশুর-শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছে। আমার দিদিশাশুড়িই ঘরের কর্ত্রী। আমার স্বামী তাঁর বন্ধের হার, তাঁর চক্ষের মণি। এইজন্যেই আমার স্বামী কায়দার গণ্ডি ডিঙিয়ে চলতে সাহস করতেন। এইজন্যেই তিনি যখন মিস গিল্‌বিকে আমার সঙ্গিনী আর শিক্ষক নিযুক্ত করলেন তখন ঘরে বাইরে যত রসনা ছিল তার সমস্ত রস বিষ হয়ে উঠল, তবু আমার স্বামীর জেদ বজায় রইল। সেই সময়েই তিনি বি. এ. পাস করে এম. এ. পড়ছিলেন। কলেজে পড়বার জন্যে তাঁকে কলকাতায় থাকতে হত। তিনি প্রায় রোজই আমাকে একটি করে চিঠি লিখতেন, তার কথা অল্প, তার ভাষা সাদা, তাঁর হাতের সেই গোটা গোটা গোল গোল অক্ষরগুলি যেন স্পিন্ডল হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত।

একটি চন্দনকাঠের বাক্সের মধ্যে আমি তাঁর চিঠিগুলি রাখতুম আর রোজ বাগান থেকে ফুল তুলে সেগুলি ঢেকে দিতুম। তখন আমার সেই রূপকথার রাজপুত্র অরুণালোকে চাঁদের মতো মিলিয়ে গেছে। সেদিন আমার সত্যকার রাজপুত্র বসেছে আমার হৃদয়-সিংহাসনে। আমি তাঁর রানী, তাঁর পাশে আমি বসতে পেরেছি; কিন্তু তার চেয়ে আনন্দ, তাঁর পায়ের কাছে আমার যথার্থ স্থান।

আমি লেখাপড়া করেছি, সুতরাং এখনকার কালের সঙ্গে আমার এখনকার ভাষাতেই পরিচয় হয়ে গেছে। আমার আজকের এই কথাগুলো আমার নিজের কাছেই কবিত্বের মতো শোনাচ্ছে। এ কালের সঙ্গে যদি আমার মোকাবিলা না হত তা হলে আমার সেদিনকার সেই ভাবটাকে সোজা গদ্য বলেই জানতুম-- মনে জানতুম মেয়ে হয়ে জন্মেছি এ যেমন আমার ঘর-গড়া কথা নয় তেমনি মেয়েমানুষ প্রেমকে ভক্তিতে গলিয়ে দেবে এও তেমনি সহজ কথা, এর মধ্যে বিশেষ কোনো একটা অপরূপ কাব্যসৌন্দর্য আছে কি না সেটা এক মুহূর্তের জন্যে ভাববার দরকার নেই।

কিন্তু সেই কিশোর বয়স থেকে আজ এই যৌবনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছতে না-পৌঁছতে আর-এক যুগে এসে পড়েছি। যেটা নিশ্বাসের মতো সহজ ছিল এখন সেটাকে কাব্যকলার মতো করে গড়ে তোলবার উপদেশ আসছে। এখনকার ভাবুক পুরুষেরা সখবার পাতিব্রত্যা এবং বিধবার ব্রহ্মচার্যে যে কী অপূর্ব কবিত্ব আছে, সে কথা প্রতিদিন সুর চড়িয়ে চড়িয়ে বলছেন। তার থেকে বোঝা যাচ্ছে জীবনের এই জায়গায় কেমন করে সত্যে আর সুন্দরে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এখন কি কেবলমাত্র সুন্দরের দোহাই দিলে আর সত্যকে ফিরে পাওয়া যাবে?

মেয়েমানুষের মন সবই যে এক-ছাঁচে-ঢালা তা আমি মনে করি নে। কিন্তু এটুকু জানি, আমার মনের মধ্যে আমার মায়ের সেই জিনিসটি ছিল, সেই ভক্তি করবার ব্যগ্রতা। সে যে আমার সহজ ভাব তা আজকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি যখন সেটা বাইরের দিক থেকে আর সহজ নেই।

এমনি আমার কপাল, আমার স্বামী আমাকে সেই পূজার অবকাশ দিতে চাইতেন না। সেই ছিল তাঁর মহত্ত্ব। তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্যে কাড়াকাড়ি করে, কেননা সে পূজনীয় নয়; পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবি করে থাকে। তাতে পূজারি ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের

একশেষ ।

কিন্তু, এত সেবা আমার জন্যে কেন ? সাজসজ্জা দাসদাসী জিনিসপত্রের মধ্যে দিয়ে যেন আমার দুই কুল ছাপিয়ে তাঁর আদরের বান ডেকে বইল । এই-সমস্তকে ঠেলে আমি নিজেকে দান করব কোন ফাঁকে ! আমার পাওয়ার সুযোগের চেয়ে দেওয়ার সুযোগের দরকার অনেক বেশি ছিল । প্রেম যে স্বভাববৈরাগী ; সে যে পথের ধারে ধুলার 'পরে আপনার ফুল অজস্র ফুটিয়ে দেয়, সে তো বৈঠকখানার চিনের টবে আপনার ঐশ্বর্য মেলতে পারে না ।

আমাদের অন্তঃপুরে যে-সমস্ত সাবেক দস্তুর চলিত ছিল আমার স্বামী তাকে সম্পূর্ণ ঠেলেতে পারতেন না । দিনে-দুপুরে যখন-তখন অবাধে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারত না । আমি জানতুম ঠিক কখন তিনি আসবেন ; তাই যেমন-তেমন এলোমেলো হয়ে আমাদের মিলন ঘটতে পারত না । আমাদের মিলন যেন কবিতার মিল ; সে আসত ছন্দের ভিতর দিয়ে, যতির ভিতর দিয়ে । দিনের কাজ সেরে গা ধুয়ে, যত্ন করে চুল বেঁধে, কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে, কোঁচানো শাড়িটি প'রে, ছড়িয়ে-পড়া দেহমনকে সমস্ত সংসার থেকে সম্পূর্ণ ফিরিয়ে এনে একজনের কাছে একটি বিশেষ সময়ের সোনার থালায় নিবেদন করে দিতুম । সেই সময়টুকু অল্প, কিন্তু অল্পের মধ্যে সে অসীম । আমার স্বামী বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ । এ নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে কোনোদিন তর্ক করি নি । কিন্তু আমার মন বলে, ভক্তিতে মানুষকে সমান হবার বাধা দেয় না । ভক্তিতে মানুষকে উপরের দিকে তুলে সমান করতে চায় । তাই সমান হতে থাকবার আনন্দ তাতে বরাবর পাওয়া যায়, কোনোদিন তা চুকে গিয়ে হেলায় জিনিস হয়ে ওঠে না । প্রেমের থালায় ভক্তি পূজা আরতির আলোর মতো-- পূজা যে করে এবং যাকে পূজা করা হয় দুয়ের উপরেই সে আলো সমান হয়ে পড়ে । আমি আজ নিশ্চয় জেনেছি, স্ত্রীলোকের ভালোবাসা পূজা করেই পূজিত হয়-- নইলে সে ধিক্ ধিক্ । আমাদের ভালোবাসার প্রদীপ যখন জ্বলে তখন তার শিখা উপরের দিকে ওঠে-- প্রদীপের পোড়া তেলই নীচের দিকে পড়তে পারে ।

প্রিয়তম, তুমি আমার পূজা চাও নি সে তোমারই যোগ্য, কিন্তু পূজা নিলে ভালো করতে । তুমি আমাকে সাজিয়ে ভালোবেসেছ, শিখিয়ে ভালোবেসেছ, যা চেয়েছি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, যা চাই নি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, আমার ভালোবাসায় তোমার চোখে পাতা পড়ে নি তা দেখেছি, আমার ভালোবাসায় তোমার লুকিয়ে নিশ্বাস পড়েছে তা দেখেছি । আমার দেহকে তুমি এমন করে ভালোবেসেছ যেন সে স্বর্গের পারিজাত, আমার স্বভাবকে তুমি এমনি করে ভালোবেসেছ যেন সে তোমার সৌভাগ্য ! এতে আমার মনে গর্ব আসে, আমার মনে হয় এ আমারই ঐশ্বর্য যার লোভে তুমি এমন করে আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ । তখন রানীর সিংহাসনে বসে মানের দাবি করি ; সে দাবি কেবল বাড়তেই থাকে, কোথাও তার তৃপ্তি হয় না । পুরুষকে বশ করবার শক্তি আমার হাতে আছে এই কথা মনে করেই কি নারীর সুখ, না তাতেই নারীর কল্যাণ ? ভক্তির মধ্যে সেই গর্বকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই তার রক্ষা । শংকর তো ভিক্ষুক হয়েই অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু এই ভিক্ষার রত্নতেজ কি অন্নপূর্ণা সহিতে পারতেন যদি তিনি শিবের জন্যে তপস্যা না করতেন ?

আজ মনে পড়ছে সেদিন আমার সৌভাগ্যে সংসারে কত লোকের মনে কত ঈর্ষার আগুন ধিকিধিকি জ্বলেছিল । ঈর্ষা হবারই তো কথা-- আমি যে অমনি পেয়েছি, ফাঁকি দিয়ে পেয়েছি । কিন্তু ফাঁকি তো বরাবর চলে না । দাম দিতেই হবে । নইলে বিধাতা সহ্য করেন না-- দীর্ঘকাল ধরে প্রতিদিন সৌভাগ্যের ঋণ শোধ করতে হয়, তবেই স্বত্ব ধুব হয়ে ওঠে । ভগবান আমাদের দিতেই পারেন, কিন্তু নিতে যে হয় নিজের গুণে । পাওয়া জিনিসও আমরা পাই নে এমনি আমাদের পোড়া কপাল ।

আমার সৌভাগ্যে কত কন্যার পিতার দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল । আমার কি তেমনি রূপ, তেমনি গুণ, আমি কি এই ঘরের যোগ্য, এমন কথা পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে উঠেছে । আমার দিদিশাশুড়ি সকলেরই অসামান্য রূপের খ্যাতি ছিল । আমার দুই বিধবা জায়ের মতো এমন সুন্দরী দেখা যায় না । পরে পরে যখন তাঁদের দুজনেরই কপাল ভাঙল তখন আমার দিদিশাশুড়ি পণ করে বসলেন যে তাঁর একমাত্র

অবশিষ্ট নাতির জন্যে তিনি আর রূপসীর খোঁজ করবেন না। আমি কেবলমাত্র সুলক্ষণের জোরে এই ঘরে প্রবেশ করতে পারলুম, নইলে আমার আর-কোনো অধিকার ছিল না।

আমাদের ঘরে এই ভোগের সংসারে খুব অল্প স্ত্রীই যথার্থ স্ত্রীর সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু সেটাই নাকি এখানকার নিয়ম, তাই মদের ফেনা আর নটীর নূপুরনিকর্ণের তলায় তাঁদের জীবনের সমস্ত কান্না তলিয়ে গেলেও তাঁরা কেবলমাত্র বড়ো ঘরের ঘরনীর অভিমান বুকে আঁকড়ে ধরে মাথাটাকে উপরে ভাসিয়ে রেখেছিলেন। অথচ আমার স্বামী মদও ছুঁলেন না, আর নারীমাংসের লোভে পাপের পণ্যশালার দ্বারে দ্বারে মনুষ্যত্বের থলি উজাড় করে ফিরলেন না, এ কি আমার গুণে? পুরুষের উদ্ভ্রান্ত উন্মত্ত মনকে বশ করবার মতো কোন্ মন্ত্র বিধাতা আমাকে দিয়েছিলেন? কেবলমাত্রই কপাল, আর-কিছুই না! আর তাঁদের বেলাতেই কি পোড়া বিধাতার হুঁশ ছিল না, সকল অক্ষরই বাঁকা হয়ে উঠল! সন্ধ্যা হতে না হতেই তাঁদের ভোগের উৎসব মিটে গেল, কেবল রূপযৌবনের বাতিগুলো শূন্য সভায় সমস্ত রাত ধরে মিছে জ্বলতে লাগল! কোথাও সংগীত নেই, কেবলমাত্রই জ্বলা!

আমার স্বামীর পৌরুষকে তাঁর দুই ভাজ অবজ্ঞা করবার ভান করতেন। এমন মানী সংসারের তরীটাকে একটিমাত্র স্ত্রীর আঁচলের পাল তুলে দিয়ে চালানো! কথায় কথায় তাঁদের কত খোঁটাই খেয়েছি। আমি যেন আমার স্বামীর সোহাগ কেবল চুরি করে করে নিচ্ছি। কেবল ছলনা, তার সমস্তই কৃত্রিম-- এখানকার কালের বিবিয়ানার নির্লজ্জতা! আমার স্বামী আমাকে হাল-ফেশানের সাজে-সজ্জায় সাজিয়েছেন-- সেই সমস্ত রঙবেরঙের জ্যাকেট-শাড়ি-শেমিজ-পেটিকোটের আয়োজন দেখে তাঁরা জ্বলতে থাকতেন। রূপ নেই, রূপের ঠাট! দেহটাকে যে একেবারে দোকান করে সাজিয়ে তুললে গো, লজ্জা করে না!

আমার স্বামী সমস্তই জানতেন। কিন্তু মেয়েদের উপর যে তাঁর হৃদয় করুণায় ভরা। তিনি আমাকে বারবার বলতেন, রাগ করো না। মনে আছে আমি একবার তাঁকে বলেছিলুম, মেয়েদের মন বড়োই ছোটো, বড়ো বাঁকা। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, চীন-দেশের মেয়েদের পা যেমন ছোটো, যেমন বাঁকা। সমস্ত সমাজ যে চার দিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে চেপে ছোটো করে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য যে ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেলছে-- দান পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে?

আমার জাঁরা তাঁদের দেওরের কাছে যা দাবি করতেন তাই পেতেন। তাঁদের দাবি ন্যায্য কি অন্যায় তিনি তার বিচারমাত্র করতেন না। আমার মনের ভিতরটা জ্বলতে থাকত যখন দেখতুম তাঁরা এর জন্যে একটুও কৃতজ্ঞ ছিলেন না। এমন-কি, আমার বড়ো জা, যিনি জপে তপে ব্রতে উপবাসে ভয়ংকর সাত্ত্বিক, বৈরাগ্য যার মুখে এত বেশি খরচ হত যে মনের জন্যে সিকি পয়সার বাকি থাকত না, তিনি বারবার আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন যে তাঁকে তাঁর উকিল দাদা বলেছেন, যদি আদালতে তিনি নালিশ করেন তা হলে তিনি-- সে কত কী, সে আর ছাই কী লিখব! আমার স্বামীকে কথা দিয়েছি যে, কোনোদিন কেনো কারণেই আমি এঁদের কথার জবাব করব না, তাই জ্বলা আরো আমার অসহ্য হত। আমার মনে হত, ভালো হবার একটা সীমা আছে, সেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের ব্যাঘাত হয়। আমার স্বামী বলতেন, আইন কিম্বা সমাজ তাঁর ভাজেদের স্বপক্ষ নয়, কিন্তু একদিন স্বামীর অধিকারের যেটাকে নিজের বলেই তাঁরা নিশ্চিত জেনেছিলেন আজ সেটাকেই ভিক্ষুকের মতো পরের মন জুগিয়ে চেয়ে-চিন্তে নিতে হচ্ছে এ অপমান যে বড়ো কঠিন। এর উপরেও আবার কৃতজ্ঞতা দাবি করা! মার খেয়ে আবার বখশিশ দিতে হবে!-- সত্য কথা বলব? অনেকবার আমি মনে মনে ভেবেছি, আর-একটু মন্দ হবার মতো তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিত ছিল।

আমার মেজো জা অন্য ধরনের ছিলেন। তাঁর বয়স অল্প, তিনি সাত্ত্বিকতার ভড়ং করতেন না। বরঞ্চ তাঁর কথাবার্তা-হাসিঠাটায় কিছু রসের বিকার ছিল। যে-সব যুবতী দাসী তাঁর কাছে রেখেছিলেন তাদের রকম-সকম একেবারেই ভালো নয়। তা নিয়ে কেউ আপত্তি করবার লোক ছিল না। কেননা এ বাড়ির ঐরকমই দস্তুর। আমি বুঝতুম আমার স্বামী যে অকলঙ্ক আমার এই বিশেষ সৌভাগ্য তাঁর কাছে অসহ্য।

তাই তাঁর দেওরের যাতায়াতের পথে ঘাটে নানারকম ফাঁদ পেতে রাখতেন। এই কথাটা কবুল করতে আমার সব চেয়ে লজ্জা হয় যে, আমার অমন স্বামীর জন্যেও মাঝে মাঝে আমার মনে ভয়-ভাবনা ঢুকত। এখানকার হাওয়াটাই যে ঘোলা, তার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ জিনিসকেও স্বচ্ছ বোধ হয় না। আমার মেজো জা মাঝে মাঝে এক-এক দিন নিজে রেঁধে-বেড়ে দেওরকে আদর করে খেতে ডাকতেন। আমার ভারি ইচ্ছে হত, তিনি যেন কোনো ছুতো করে বলেন, না, আমি যেতে পারব না।-- যা মন্দ তার তো একটা শাস্তি পাওনা আছে? কিন্তু, ফি বারেই যখন তিনি হাসিমুখে নিমন্ত্রণ রাখতে যেতেন আমার মনের মধ্যে একটু কেমন-- সে আমার অপরাধ-- কিন্তু কী করব, আমার মন মানত না-- মনে হত এর মধ্যে পুরুষমানুষের একটু চঞ্চলতা আছে। সে সময়টাতে আমার অন্য সহস্র কাজ থাকলেও কোনো একটা ছুতো করে আমার মেজো জায়ের ঘরে গিয়ে বসতুম। মেজো জা হেসে হেসে বলতেন, বাস্ রে, ছোটোরানীর একদণ্ড চোখের আড়াল হবার জো নেই-- একেবারে কড়া পাহারা! বলি, আমাদেরও তো এক দিন ছিল, কিন্তু এত করে আগলে রাখতে শিখি নি।

আমার স্বামী এঁদের দুঃখটাই দেখতেন, দোষ দেখতে পেতেন না। আমি বলতুম, আচ্ছা, না হয় যত দোষ সবই সমাজের, কিন্তু অত বেশি দয়া করবার দরকার কী? মানুষ না হয় কিছু কষ্টই পেলে, তাই বলেই কি-- কিন্তু তাঁর সঙ্গে পারবার জো নেই। তিনি তর্ক না করে একটুখানি হাসতেন। বোধ হয় আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি কাঁটা ছিল সেটুকু তাঁর অজানা ছিল না। আমার রাগের সত্যিকার ঝাঁজটুকু সমাজের উপরেও না, আর-কারো উপরেও না, সে কেবল-- সে আর বলব না। স্বামী এক দিন আমাকে বোঝালেন-- তোমার এই যে-সমস্তকে ওরা মন্দ বলছে যদি সত্যিই এগুলিকে মন্দ জানত তা হলে এতে ওদের এত রাগ হত না।

তা হলে এমন অন্যায় রাগ কিসের জন্যে?

অন্যায় বলব কেমন করে? ঈর্ষা জিনিসটার মধ্যে একটি সত্য আছে, সে হচ্ছে এই যে, যা-কিছু সুখের সেটি সকলেরই পাওয়া উচিত ছিল।

তা, বিধাতার সঙ্গে ঝগড়া করলেই হয়, আমার সঙ্গে কেন?

বিধাতাকে যে হাতের কাছে পাওয়া যায় না।

তা ওঁরা যা পেতে চান তা নিলেই হয়। তুমি তো বঞ্চিত করতে চাও না। পরুন-না শাড়ি-জ্যাকেট গয়না জুতো-মোজা, মেমের কাছে পড়তে চান তো সে তো ঘরেই আছে, আর বিয়েই যদি করতে চান তুমি তো বিদ্যাসাগরের মতো অমন সাতটা সাগর পেরোতে পার তোমার এমন সম্বল আছে।

ঐ তো মুশকিল-- মন যা চায় তা হাতে তুলে দিলেও নেবার জো নেই।

তাই বুঝি কেবল ন্যাকামি করতে হয়, যেন যেটা পাই নি সেটা মন্দ, অথচ অন্য কেউ পেলে সর্বশরীর জ্বলতে থাকে।

যে মানুষ বঞ্চিত এমনি করেই সে আপনার বঞ্চনার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে চায়-- ঐ তার সান্ত্বনা।

যাই বল তুমি, মেয়েরা বড়ো ন্যাকা। ওরা সত্যি কথাকে কবুল করতে চায় না, ছল করে।

তার মানে ওরা সব চেয়ে বঞ্চিত।

এমনি করে উনি যখন বাড়ির মেয়েদের সব রকম ক্ষুদ্রতাই উড়িয়ে দিতেন আমার রাগ হত। সমাজ কী হলে কী হতে পারত সে-সব কথা কয়ে তো কোনো লাভ নেই, কিন্তু পথে ঘাটে চারি দিকে এই-যে কাঁটা গজিয়ে রইল, এই-যে বাঁকা কথার টিটকারী, এই-যে পেটে এক মুখে এক, একে দয়া করতে পারা যায় না।

সে কথা শুনে তিনি বললেন, যেখানে তোমার নিজের একটু কোথাও বাজে সেইখানেই বুঝি তোমার যত দয়া, আর যেখানে ওদের জীবনের এপিঠ-ওপিঠ ফুঁড়ে সমাজের শেল বিঁধেছে সেখানে দয়া করবার কিছু নেই? যারা পেটেও খাবে না তারাই পিঠেও সহবে?

হবে, হবে, আমারই মন ছোটো। আর সকলেই ভালো, কেবল আমি ছাড়া। রাগ করে বললুম,

তোমাকে তো ভিতরে থাকতে হয় না, সব কথা জান না-- এই বলে আমি তাঁকে ও মহলের একটা

বিশেষ খবর দেবার চেষ্টা করতেই তিনি উঠে পড়লেন, বললেন চন্দ্রনাথবাবু অনেক ক্ষণ বাইরে বসে আছেন।

আমি বসে বসে কাঁদতে লাগলুম। স্বামীর কাছে এমন ছোটো প্রমাণ হয়ে গেলে বাঁচি কী করে? আমার ভাগ্য যদি বঞ্চিত হত তা হলেও আমি যে কখনো ওদের মতো এমনতরো হতুম না সে তো প্রমাণ করবার জো নেই।

দেখো, আমার এক-একবার মনে হয় রূপের অভিমানের সুযোগ বিধাতা যদি মেয়েদের দেন, তবে অন্য অনেক অভিমানের দুর্গতি থেকে তারা রক্ষা পায়। হীরে-জহরতের অভিমান করাও চলত, কিন্তু রাজার ঘরে তার কোনো অর্থই নেই। তাই আমার অভিমান ছিল সতীত্বের। সেখানে আমার স্বামীকেও হার মানতে হবে এটা আমার মনে ছিল। কিন্তু যখনই সংসারের কোনো খিটিমিটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে গেছি তখনই বারবার এমন ছোটো হয়ে গেছি যে, সে আমাকে মেরেছে। তাই তখন আমি তাঁকেই উলটে ছোটো করতে চেয়েছি। মনে মনে বলেছি, তোমার এ-সব কথা কে ভালো বলে মানব না, এ কেবলমাত্র ভালোমানুষি। এ তো নিজেকে দেওয়া নয়, এ অন্যের কাছে ঠকা।

আমার স্বামীর বড়ো ইচ্ছা ছিল আমাকে বাইরে বের করবেন। একদিন আমি তাঁকে বললুম, বাইরেতে আমার দরকার কী?

তিনি বললেন, তোমাকে বাইরের দরকার থাকতে পারে।

আমি বললুম, এতদিন যদি তার চলে গিয়ে থাকে আজও চলবে, সে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে না।

মরে তো মরুক-না, সেজন্য আমি ভাবছি নে-- আমি আমার জন্যে ভাবছি।

সত্যি নাকি, তোমার আবার ভাবনা কিসের?

আমার স্বামী হাসিমুখে চুপ করে রইলেন। আমি তাঁর ধরন জানি, তাই বললুম, না, অমন চুপ করে ফাঁকি দিয়ে গেলে চলবে না, এ কথাটা তোমার শেষ করে যেতে হবে।

তিনি বললেন, কথা কি মুখের কথাতেই শেষ হয়? সমস্ত জীবনের কত কথা শেষ হয় না।

না, তুমি হেঁয়ালি রাখো, বলো।

আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ঐখানে আমাদের দেনাপাওনা বাকি আছে।

কেন, ঘরের মধ্যে পাওয়ার কমতি হল কোথায়?

এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ কান মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে-- তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না।

খুব জানি গো খুব জানি।

মনে করছ জানি, কিন্তু জান কি না তাও জান না।

দেখো, তোমার এই কথাগুলো সহিতে পারি নে।

সেইজন্যেই তো বলতে চাই নি।

তোমার চুপ করে থাকা আরো সহিতে পারি নে।

তাই তো আমার ইচ্ছে, আমি কথাও কইব না, চুপও করব না, তুমি একবার বিশ্বেশ্বর মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকর্নাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হও নি, আমিও হই নি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।

পরিচয় তোমার হয়তো বাকি থাকতে পারে, কিন্তু আমার কিছুই বাকি নেই।

বেশ তো, আমারই যদি বাকি থাকে সেটুকু পূরণ করেই দাও-না কেন?

এ কথা নানা রকম আকারে বারবার উঠেছে। তিনি বলতেন, যে পেটুক মাছের ঝোল ভালোবাসে সে মাছকে কেটেকুটে সাঁত্লে সিদ্ধ করে মসলা দিয়ে নিজের মনের মতোটি করে নেয়, কিন্তু যে লোক মাছকেই সত্য ভালোবাসে সে তাকে পিতলের হাঁড়িতে রেঁধে পাথরের বাটিতে ভর্তি করতে চায় না--

সে তাকে ছাড়া জলের মধ্যেই বশ করতে পারে তো ভালো, না পারে তো ডাঙায় বসে অপেক্ষা করে-- তার পরে যখন ঘরে ফেরে তখন এইটুকু তার সান্ত্বনা থাকে যে, যাকে চাই তাকে পাই নি, কিন্তু নিজের শখের বা সুবিধার জন্য তাকে ছেঁটে ফেলে নষ্ট করি নি। আস্ত পাওয়াটাই সব চেয়ে ভালো, নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তবে আস্ত হারানোটাও ভালো।

এ-সব কথা আমার একেবারেই ভালো লাগত না, কিন্তু সেইজন্যেই যে তখন বের হই নি তা নয়। আমার দিদিশাশুড়ি তখন বেঁচে ছিলেন। তাঁর অমতে আমার স্বামী বিংশ শতাব্দীর প্রায় বিশ-আনা দিয়েই ঘর ভর্তি করে তুলেছিলেন, তিনিও সয়েছিলেন; রাজবাড়ির বউ যদি পর্দা ঘুচিয়ে বাইরে বেরোত তা হলেও তিনি সহ্যতেন; তিনি নিশ্চয় জানতেন এটাও একদিন ঘটবে, কিন্তু আমি ভাবতুম এটা এতই কি জরুরি যে তাঁকে কষ্ট দিতে যাব। বইয়ে পড়েছি আমরা খাঁচার পাখি, কিন্তু অন্যের কথা জানি নে, এই খাঁচার মধ্যে আমার এত ধরেছে যে বিশ্বেও তা ধরে না। অন্তত তখন তো সেইরকমই ভাবতুম।

আমার দিদিশাশুড়ি যে আমাকে এত ভালোবাসতেন তার গোড়ার কারণটা এই যে, তাঁর বিশ্বাস আমি আমার স্বামীর ভালোবাসা টানতে পেরেছিলুম সেটা যেন কেবল আমারই গুণ, কিম্বা আমার গ্রহনক্ষত্রের চক্রান্ত। কেননা, পুরুষমানুষের ধর্মই হচ্ছে রসাতলে তলিয়ে যাওয়া। তাঁর অন্য কোনো নাতিকে তাঁর নাতবউরা সমস্ত রূপযৌবন নিয়েও ঘরের দিকে টানতে পারে নি, তাঁরা পাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন, কেউ তাঁদের বাঁচাতে পারলেন না। তাঁদের ঘরে পুরুষমানুষের এই মরণের আগুন আমিই নেবালুম এই ছিল তাঁর ধারণা। সেইজন্যেই তিনি আমাকে যেন বুক করে রেখেছিলেন; আমার একটু অসুখবিসুখ হলে তিনি ভয়ে কাঁপতেন। আমার স্বামী সাহেবের দোকান থেকে যে-সমস্ত সজসজ্জা এনে সাজাতেন সে তাঁর পছন্দসই ছিল না। কিন্তু তিনি ভাবতেন পুরুষমানুষের এমন কতকগুলো শখ থাকবেই যা নিতান্ত বাজে, যাতে কেবলই লোকসান। তাকে ঠেকাতে গেলেও চলবে না, অথচ সে যদি সর্বনাশ পর্যন্ত না পৌঁছয় তবেই রক্ষা। আমার নিখিলেশ বউকে যদি না সাজাত আর-কাউকে সাজাতে যেত। এইজন্যে ফি বারে যখন আমার জন্যে কোনো নতুন কাপড় আসত তিনি তাই নিয়ে আমার স্বামীকে ডেকে কত ঠাট্টা কত আমোদ করতেন। হতে হতে শেষকালে তাঁরও পছন্দের রঙ ফিরেছিল। কলিযুগের কল্যাণে অবশেষে তাঁর এমন দশা হয়েছিল যে নাতবউ তাঁকে ইংরিজি বই থেকে গল্প না বললে তাঁর সন্ধ্যা কাটত না।

দিদিশাশুড়ির মৃত্যুর পর আমার স্বামীর ইচ্ছা হল আমরা কলকাতায় গিয়ে থাকি। কিন্তু কিছুতেই আমার মন উঠল না। এ যে আমার শিশুরের ঘর, দিদিশাশুড়ি কত দুঃখ কত বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে কত যত্নে একে এতকাল আগলে এসেছেন, আমি সমস্ত দায় একেবারে ঘুচিয়ে দিয়ে যদি কলকাতায় চলে যাই তবে যে আমাকে অভিশাপ লাগবে-- এই কথাই বারবার আমার মনে হতে লাগল।

দিদিশাশুড়ির শূন্য আসন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সেই সাধী আট বছর বয়সে এই ঘরে এসেছেন, আর উনআশি বছরে মারা গেছেন। তাঁর সুখের জীবন ছিল না। ভাগ্য তাঁর বুক একটার পর একটা কত বাণই হেনেছে, কিন্তু প্রত্যেক আঘাতেই তাঁর জীবন থেকে অমৃত উছলে উঠেছে। এই বৃহৎ সংসার সেই চোখের জলে গলানো পুণ্যের ধারায় পবিত্র। এ ছেড়ে আমি কলকাতার জঞ্জালের মধ্যে গিয়ে কী করব।

আমার স্বামী মনে করেছিলেন, এই সুযোগে আমার দুই জায়ের উপর এখানকার সংসারের কর্তৃত্ব দিয়ে গেলে তাতে তাঁদের মনেও সান্ত্বনা হত, আর আমাদেরও জীবনটা কলকাতায় একটু ডালপালা মেলবার জায়গা পেত।

আমার ঐখানেই গোল বেধেছিল। ওঁরা যে এতদিন আমাকে হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়েছেন, আমার স্বামীর ভালো ওঁরা কখনো দেখতে পারেন নি-- আজ কি তারই পুরস্কার পাবেন?

আর, রাজসংসার তো এইখানেই। আমাদের সমস্ত প্রজা-আমলা, আশ্রিত-অভ্যাগত-আত্মীয়, সমস্তই এখানকার এই বাড়িকে চারি দিকে আঁকড়ে। কলকাতায় আমরা কে তা জানি নে, অন্য কজন লোকই

বা জানে ! আমাদের মান-সম্মান-ঐশ্বর্যের পূর্ণ মূর্তিই এখানে । এ সমস্তই ওঁদের হাতে দিয়ে সীতা যেমন নির্বাসনে গিয়েছিলেন তেমনি করে চলে যাব ! আর, ওঁরা পিছন থেকে হাসবেন ? ওঁরা কি আমার স্বামীর এ দক্ষিণ্যের মর্যাদা বোঝেন, না তার যোগ্য ওঁরা ?

তার পরে যখন কোনোদিন এখানে ফিরে আসতে হবে তখন আমার আসনটি কি আর ফিরে পাব ? আমার স্বামী বলতেন, দরকার কী তোমার ঐ আসনের ? ও ছাড়াও তো জীবনের আরো অনেক জিনিস আছে, তার দাম অনেক বেশি ।

আমি মনে মনে বললুম, পুরষমানুষ এ-সব কথা ঠিক বোঝে না । সংসারটা যে কতখানি তা ওদের সম্পূর্ণ জানা নেই, সংসারের বাহির-মহলে যে ওদের বাসা । এ জায়গায় মেয়েদের বুদ্ধিমতেই ওদের চলা উচিত ।

সব চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, একটা তেজ থাকা চাই তো । যাঁরা চিরদিন এমন শত্রুতা করে এসেছেন তাঁদের হাতে সমস্ত দিয়ে-থুয়ে চলে যাওয়া যে পরাভব । আমার স্বামী যদি বা তা মানতে চান আমি তো মানতে দিতে পারব না । আমি মনে মনে জানলুম, এ আমার সতীত্বের তেজ ।

আমার স্বামী আমাকে জোর করে কেন নিয়ে গেলেন না ? আমি জানি কেন । তাঁর জোর আছে বলেই জোর করেন নি । তিনি আমাকে বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রী বলেই যে তুমি আমাকে কেবলই মেনে চলবে তোমার উপর আমার এ দৌরাঅ্য আমার নিজেরই সহাবে না । আমি অপেক্ষা করে থাকব আমার সঙ্গে যদি তোমার মেলে তো ভালো, যদি না মেলে তো উপায় কী !

কিন্তু তেজ বলে একটা জিনিস আছে--সেদিন আমার মনে হয়েছিল ঐ জায়গায় আমি যেন আমার--না, এ কথা আর মুখে আনাও চলবে না ।

রাত্রির সঙ্গে দিনের যে তফাত সেটাকে যদি ঠিক হিসাবমত ক্রমে ক্রমে ঘোচাতে হত তা হলে সে কি কোনো যুগে ঘুচত ? কিন্তু সূর্য উঠে পড়ে, অন্ধকার চুকে যায়, অসীম কালের হিসাব মুহূর্তকালে মেটে ।

বাংলা দেশে একদিন স্বদেশীর যুগ এসেছিল, কিন্তু সে যে কেমন করে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না । তার আগেকার সঙ্গে এ যুগের মাঝখানকার ক্রম যেন নেই । বোধ করি সেইজন্মেই নূতন যুগ একেবারে বাঁধা ঠাণ্ডা বন্যার মতো আমাদের ভয়-ভাবনা চোখের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল । কী হল, কী হবে, তা বোঝবার সময় পাই নি ।

পাড়ায় বর আসছে, তার বাঁশি বাজছে, তার আলো দেখা দিয়েছে, অমনি মেয়েরা যেমন ছাতে বারান্দায় জানলায় বেরিয়ে পড়ে, তাদের আবরণের দিকে আর মন থাকে না, তেমনি সেদিন সমস্ত দেশের বর আসবার বাঁশি যেমন শোনা গেল মেয়েরা কি আর ঘরের কাজ নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারে ? হুঁলু দিতে দিতে, শাঁখ বাজাতে বাজাতে, তারা যেখানে দরজা জানলা দেয়ালের ফাঁক পেলে সেইখানেই মুখ বাড়িয়ে দিলে ।

সেদিন আমারও দৃষ্টি এবং চিত্ত, আশা এবং ইচ্ছা উন্মত্ত নবযুগের আবির্ভাব লাল হয়ে উঠেছিল ।

এতদিন মন যে জগৎটাকে একান্ত বলে জেনেছিল এবং জীবনের ধর্মকর্ম আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা যে সীমাকুর মধ্যে বেশ গুছিয়ে সাজিয়ে সুন্দর করে তোলবার কাজে প্রতিদিন লেগে ছিল সেদিনও তার বেড়া ভাঙে নি বটে, কিন্তু সেই বেড়ার উপরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যে একটি দূর দিগন্তের ডাক শুনলুম স্পষ্ট তার মানে বুঝতে পারলুম না, কিন্তু মন উতলা হয়ে গেল ।

আমার স্বামী যখন কলেজে পড়তেন তখন থেকেই তিনি দেশের প্রয়োজনের জিনিস দেশেই উৎপন্ন করবেন বলে নানারকম চেষ্টা করেছিলেন । আমাদের জেলায় খেজুর গাছ অজস্র-- কী করে অনেক গাছ থেকে একটি নলের সাহায্যে একসঙ্গে এক জায়গায় রস আদায় করে সেইখানেই জাল দিয়ে সহজে চিনি করা যেতে পারে সেই চেষ্টায় তিনি অনেক দিন কাটালেন । শুনেছি উপায় খুব সুন্দর উদ্ভাবন হয়েছিল, কিন্তু তাতে রসের তুলনায় টাকা এত বেশি গলে পড়তে লাগল যে কারবার টিকল না । চাষের কাজে নানারকম পরীক্ষা করে তিনি যে-সব ফসল ফলিয়েছিলেন সে অতি আশ্চর্য, কিন্তু তাতে যে টাকা খরচ

করেছিলেন সে আরো বেশি আশ্চর্য। তাঁর মনে হল আমাদের দেশে বড়ো বড়ো কারবার যে সম্ভবপর হয় না তার প্রধান কারণ আমাদের ব্যাঙ্ক নেই। সেই সময় তিনি আমাকে পোলিটিক্যাল ইকনমি পড়াতে লাগলেন। তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাঁর মনে হল সব-প্রথমে দরকার ব্যাঙ্কে টাকা সঞ্চয় করবার অভ্যাস ও ইচ্ছা আমাদের জনসাধারণের মনে সঞ্চার করে দেওয়া। একটা ছোটো গোছের ব্যাঙ্ক খুললেন। ব্যাঙ্কে টাকা জমাবার উৎসাহ গ্রামের লোকের খুব জেগে উঠল, কারণ সুদের হার খুব চড়া ছিল। কিন্তু যে কারণে লোকের উৎসাহ বাড়তে লাগল সেই কারণেই ঐ মোটা সুদের হিঁদ্র দিয়ে ব্যাঙ্ক গেল তলিয়ে। এই-সকল কাণ্ড দেখে তাঁর পুরাতন আমলারা অত্যন্ত বিরক্ত ও উদ্ভিগ্ন হয়ে উঠত, শত্রুপক্ষ ঠাট্টাবিদূপ করত। আমার বড়ো জা একদিন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, তাঁর বিখ্যাত উকিল খুড়তুত ভাই তাঁকে বলেছেন যদি জজের কাছে দরবার করা যায় তবে এই পাগলের হাত থেকে এই বনেদি বংশের মানসন্ত্রম বিষয়সম্পত্তি এখনো রক্ষা হবার উপায় হতে পারে।

সমস্ত পরিবারের মধ্যে কেবল আমার দিদিশাশুড়ির মনে বিকার ছিল না। তিনি আমাকে ডেকে কতবার ভর্ৎসনা করেছেন; বলেছেন, কেন তোরা ওকে সবাই মিলে বিরক্ত করছিস? বিষয় সম্পত্তির কথা ভাবছিস? আমার বয়সে আমি তিনবার এ সম্পত্তি রিসীভরের হাতে যেতে দেখেছি। পুরুষেরা কি মেয়েমানুষের মতো? ওরা যে উড়নচণ্ডী, ওরা ওড়াতেই জানে। নাতবউ, তোর কপাল ভালো যে সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেও উড়ছে না। দুঃখ পাস নি বলেই সে কথা মনে থাকে না।

আমার স্বামীর দানের লিস্ট ছিল খুব লম্বা। তাঁতের কল কিম্বা ধান ভানার যন্ত্র কিম্বা ঐরকম একটা-কিছু যে-কেউ তৈরি করবার চেষ্টা করেছে তাকে তার শেষ নিষ্ফলতা পর্যন্ত তিনি সাহায্য করেছেন। বিলাতি কোম্পানির সঙ্গে টক্কর দিয়ে পুরী-যাত্রার জাহাজ চালাবার স্বদেশী কোম্পানী উঠল; তার একখানা জাহাজও ভাসে নি, কিন্তু আমার স্বামীর অনেকগুলি কোম্পানির কাগজ ডুবেছে। সব চেয়ে আমার বিরক্ত লাগত সন্দীপবাবু যখন দেশের নানা উপকারের ছুতোয় তাঁর টাকা শুষে নিতেন। তিনি খবরের কাগজ চালাবেন, স্বাদেশিকতা প্রচার করতে যাবেন, ডাক্তারের পরামর্শমতে তাঁকে কিছুদিনের জন্য উটকামন্দে যেতে হবে-- নির্বিচারে আমার স্বামী তার খরচ জুগিয়েছেন। এ ছাড়া সংসার-খরচের জন্য নিয়মিত তাঁর মাসিক বরাদ্দ আছে। অথচ আশ্চর্য এই যে, আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর যে মতের মিল আছে তাও নয়। আমার স্বামী বলতেন, দেশের খনিতে যে পণ্যদ্রব্য আছে তাকে উদ্ধার করতে না পারলে যেমন দেশের দারিদ্র্য, তেমনি দেশের চিত্তে যেখানে শক্তির রত্নখনি আছে তাকে যদি আবিষ্কার এবং স্বীকার না করা যায় তবে সে দারিদ্র্য আরো গুরুতর। আমি তাঁকে একদিন রাগ করে বলেছিলুম, এরা তোমাকে সবাই ফাঁকি দিচ্ছে। তিনি হেসে বললেন, আমার গুণ নেই, অথচ কেবলমাত্র টাকা দিয়ে গুণের অংশীদার হচ্ছি-- আমিই তো ফাঁকি দিয়ে লাভ করে নিলুম। এই পূর্বযুগের পরিচয় কিছু বলে রাখা গেল, নইলে নবযুগের নাট্যটা স্পষ্ট বোঝা যাবে না। এই যুগের তুফান যেই আমার রক্তে লাগল আমি প্রথমেই স্বামীকে বললুম, বিলিতি জিনিসে তৈরি আমার সমস্ত পোশাক পুড়িয়ে ফেলব।

স্বামী বললেন, পোড়াবে কেন? যতদিন খুশি ব্যবহার না করলেই হবে।

কী তুমি বলছ 'যতদিন খুশি'! ইহজীবনে আমি কখনো--

বেশ তো, ইহজীবনে তুমি নাহয় ব্যবহার করবে না। ঘটা করে নাই পোড়ালে?

কেন এতে তুমি বাধা দিচ্ছ?

আমি বলছি, গড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই।

এই উত্তেজনাতেই গড়ে তোলবার সাহায্য হয়।

তাই যদি বল তবে বলতে হয় ঘরে আগুন না লাগালে ঘর আলো করা যায় না। আমি প্রদীপ

জ্বালাবার হাজার ঝঞ্জট পোয়াতে রাজি আছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি সুবিধের জন্যে ঘরে আগুন লাগাতে রাজি নই। ওটা দেখাতেই বাহাদুরি, কিন্তু আসলে দুর্বলতার গোঁজামিলন।

আমার স্বামী বললেন, দেখো, বুঝছি আমার কথা আজ তোমার মনে নিচ্ছে না, তবু আমি এ কথাটি তোমাকে বলছি-- ভেবে দেখো। মা যেমন নিজের গয়না দিয়ে তার প্রত্যেক মেয়েকে সাজিয়ে দেয়, আজ তেমনি এমন একটা দিন এসেছে যখন সমস্ত পৃথিবী প্রত্যেক দেশকে আপন গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। আজ আমাদের খাওয়াপরা চলাফেরা ভাবাচিন্তা সমস্তই সমস্ত-পৃথিবীর যোগে। আমি তাই মনে করি এটা প্রত্যেক জাতিরই সৌভাগ্যের যুগ-- এই সৌভাগ্যকে অস্বীকার করা বীরত্ব নয়। তার পরে আর-এক ল্যাঠা। মিস গিল্‌বি যখন আমাদের অন্তঃপুরে এসেছিল তখন তাই নিয়ে কিছুদিন খুব গোলমাল চলেছিল। তার পরে অভ্যাসক্রমে সেটা চাপা পড়ে গেছে। আবার সমস্ত ঘুলিয়ে উঠল। মিস গিল্‌বি ইংরেজ কি বাঙালি অনেক দিন সে কথা আমারও মনে হয় নি, কিন্তু মনে হতে শুরু হল। আমি স্বামীকে বললুম, মিস গিল্‌বিকে ছাড়িয়ে দিতে হবে। স্বামী চুপ করে রইলেন। আমি সেদিন তাঁকে যা মুখে এল তাই বলেছিলুম, তিনি স্মান মুখ করে চলে গেলেন। আমি খুব খানিকটা কাঁদলুম। কেঁদে যখন আমার মনটা একটু নরম হল তিনি রাত্রে এসে বললেন, দেখো, মিস গিল্‌বিকে কেবলমাত্র ইংরেজ বলে ঝাপসা করে দেখতে আমি পারি নে। এতদিনের পরিচয়েও কি ঐ নামের বেড়াটা ঘুচবে না? ও যে তোমাকে ভালোবাসে।

আমি একটুখানি লজ্জিত হয়ে অথচ নিজের অভিমানের অল্প একটু ঝাঁজ বজায় রেখে বললুম, আচ্ছা, থাক-না, ওকে কে যেতে বলছে?

মিস গিল্‌বি রয়ে গেল। একদিন গির্জেয় যাবার সময় পথের মধ্যে আমাদেরই একজন দূরসম্পর্কের আত্মীয় ছেলে তাকে টিল ছুঁড়ে মেরে অপমান করলে। আমার স্বামীই এতদিন সেই ছেলেকে পালন করেছিলেন; তিনি তাকে তাড়িয়ে দিলেন। এই নিয়ে ভারি একটা গোল উঠল। সেই ছেলে যা বললে সবাই তাই বিশ্বাস করলে। লোকে বললে, মিস গিল্‌বিই তাকে অপমান করেছে এবং তার সম্বন্ধে বানিয়ে বলেছে। আমারও কেমন মনে হয়, সেটা অসম্ভব নয়। ছেলেটার মা নেই, তার খুড়ো এসে আমাকে ধরলে। আমি তার হয়ে অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু কোনো ফল হল না।

সেদিনকার দিনে আমার স্বামীর এই ব্যবহার কেউ ক্ষমা করতে পারলে না। আমিও না। আমি মনে মনে তাঁকে নিন্দাই করলুম। এইবার মিস গিল্‌বি আপনাই চলে গেল। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে জল পড়ল, কিন্তু আমার মন গলল না। আহা, মিথ্যা করে ছেলেটার এমন সর্বনাশ করে গেল গো! আর, অমন ছেলে! স্বদেশীর উৎসাহে তার নাওয়া-খাওয়া ছিল না। আমার স্বামী নিজের গাড়ি করে মিস গিল্‌বিকে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন। সেটা আমার বড়ো বাড়াবাড়ি বোধ হল। এই কথাটা নিয়ে নানা ডালপালা দিয়ে কাগজে যখন গাল দিলে আমার মনে হল, এই শাস্তি ওঁর পাওনা ছিল।

ইতিপূর্বে আমি আমার স্বামীর জন্যে অনেকবার উদ্‌বিগ্ন হয়েছি, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর জন্যে একদিনও লজ্জা বোধ করি নি। এবার লজ্জা হল। মিস গিল্‌বির প্রতি নরেন কী অন্যায় করেছে না-করেছে সে আমি জানি নে, কিন্তু আজকের দিনে তা নিয়ে সদ্বিচার করতে পারাটাই লজ্জার কথা। যে ভাবের থেকে নরেন ইংরেজ মেয়ের প্রতি ঔদ্ধত্য করতে পেরেছে আমি তাকে কিছুতেই দমিয়ে দিতে চাই নে। এই কথাটা আমার স্বামী যে কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না, আমার মনে হল সেটা তাঁর পৌরুষের অভাব। তাই আমার মনে লজ্জা হল।

শুধু তাই নয়, আমার সব চেয়ে বৃদ্ধি বিধেছিল যে, আমাকে হার মানতে হয়েছে। আমার তেজ কেবল আমাকেই দক্ষ করলে, কিন্তু আমার স্বামীকে উজ্জ্বল করলে না। এই তো আমার সতীত্বের অপমান।

অথচ স্বদেশী কাণ্ডের সঙ্গে যে আমার স্বামীর যোগ ছিল না বা তিনি এর বিরুদ্ধে ছিলেন তা নয়। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটি তিনি চূড়ান্ত করে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বলতেন, দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।

এমন সময়ে সন্দীপবাবু স্বদেশী প্রচার করবার জন্যে তাঁর দলবল নিয়ে আমাদের ওখানে এসে উপস্থিত হলেন। বিকেলবেলায় আমাদের নাট্যমন্দিরে সভা হবে। আমরা মেয়েরা দালানের এক দিকে চিক ফেলে বসে আছি। ‘বন্দে মাতরম্’ শব্দের সিংহনাদ ক্রমে ক্রমে কাছে আসছে, আমার বুকের ভিতরটা গুর্ গুর্ করে কেঁপে উঠছে। হঠাৎ পাগড়ি-বাঁধা গেরুয়া-পরা যুবক ও বালকের দল খালি পায়ে আমাদের প্রকাণ্ড আঙিনার মধ্যে, মরা নদীতে প্রথম বর্ষার গেরুয়া বন্যার ধারার মতো, ছড় ছড় করে ঢুকে পড়ল। লোকে লোকে ভরে গেল। সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে একটা বড়ো চৌকির উপর বসিয়ে দশ-বারো জন ছেলে সন্দীপবাবুকে কাঁধে করে নিয়ে এল। বন্দে বাতরম্ ! বন্দে মাতরম্ ! বন্দে মাতরম্ ! আকাশটা যেন ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়বে মনে হল।

সন্দীপবাবুর ফোটোগ্রাফ পূর্বেই দেখেছিলুম। তখন যে ঠিক ভালো লেগেছিল তা বলতে পারি নে। কুশ্রী দেখতে নয়, এমন-কি, রীতিমত সুশ্রীই। তবু জানি না কেন আমার মনে হয়েছিল উজ্জ্বলতা আছে বটে, কিন্তু চেহারাটা অনেকখানি খাদে মিশিয়ে গড়া-- চোখে আর ঠোঁটে কী-একটা আছে যেটা খাঁটি নয়। সেইজন্যেই আমার স্বামী যখন বিনা বাধায় তাঁর সকল দাবি পূরণ করতেন আমার ভালো লাগত না। অপব্যয় আমি সহিতে পারতুম, কিন্তু আমার কেবলই মনে হত বন্ধু হয়ে এ লোকটা আমার স্বামীকে ঠকাচ্ছে। কেননা, ভাবখানা তো তপস্বীর মতো নয়, গরিবের মতোও নয়, দিব্যি বাবুর মতো। ভিতরে আরামের লোভ আছে, অথচ-- এইরকম নানা কথা আমার মনে উদয় হয়েছিল। আজ সেই-সব কথা মনে উঠছে-- কিন্তু থাক্।

কিন্তু, সেদিন সন্দীপবাবু যখন বক্তৃতা দিতে লাগলেন আর এই বৃহৎ সভার হৃদয় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠে কূল ছাপিয়ে ভেসে যাবার জো হল তখন তাঁর সে এক আশ্চর্য মূর্তি দেখলুম। বিশেষত এক সময় সূর্য ক্রমে নেমে এসে ছাদের নীচে দিয়ে তাঁর মুখের উপর যখন হঠাৎ রৌদ্র ছড়িয়ে দিলে তখন মনে হল, তিনি যে অমর-লোকের মানুষ এই কথাটা দেবতা সেদিন সমস্ত নরনারীর সামনে প্রকাশ করে দিলেন। বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক কথায় যেন ঝড়ের দমকা হাওয়া। সাহসের অন্ত নেই। আমার চোখের সামনে যেটুকু চিকের আড়াল ছিল সে আমি সহিতে পারছিলুম না। কখন নিজের অগোচরে চিক খানিকটা সরিয়ে ফেলে মুখ বের করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ছিলুম আমার মনে পড়ে না। সমস্ত সভায় এমন একটি লোক ছিল না আমার মুখ দেখবার যার একটু অবকাশ ছিল। কেবল এক সময় দেখলুম কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়ল। কিন্তু আমার হৃৎ ছিল না। আমি কি তখন রাজবাড়ির বউ ? আমি তখন বাংলাদেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি আর তিনি বাংলাদেশের বীর। যেমন আকাশের সূর্যের আলো তাঁর ঐ ললাটের উপর পড়েছে, তেমনি দেশের নারীচিন্তের অভিষেক যে চাই। নইলে তাঁর রণযাত্রার মাঙ্গল্য পূর্ণ হবে কী করে ?

আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারলুম, আমার মুখের দিকে চাওয়ার পর থেকে তাঁর ভাষার আশ্রয় আরো জ্বলে উঠল। ইন্দ্রের উচ্চৈশ্রবা তখন আর রাশ মানতে চাইল না-- বজ্রের উপর বজ্রের গর্জন, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুতের চমকানি। আমার মন বললে, আমারই চোখের শিখায় এই আশ্রয় ধরিয়ে দিলে। আমরা কি কেবল লক্ষ্মী, আমরাই তো ভারতী।

সেদিন একটা অপূর্ব আনন্দ এবং অহংকারের দীপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। ভিতরে একটা আশ্রয়ের ঝড়ের বেগ আমাকে এক মুহূর্তে এক কেন্দ্র থেকে আর-এক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল। আমার ইচ্ছা করত লাগল গ্রীসের বীরাজনার মতো আমার চুল কেটে দিই ঐ বীরের হাতের ধনুকের ছিলা করবার জন্য, আমার এই আজানুলসিত চুল। যদি ভিতরকার চিন্তের সঙ্গে বাইরের গয়নার যোগ থাকত তা হলে আমার কণ্ঠী, আমার গলার হার, আমার বাজুবন্ধ উল্কাবৃষ্টির মতো সেই সভায় ছুটে ছুটে খসে খসে পড়ে যেত। নিজের অত্যন্ত একটা ক্ষতি করতে পারলে তবেই যেন সেই আনন্দের উৎসাহবেগ সহ্য করা সম্ভব হতে পারত।

সন্ধ্যাবেলায় আমার স্বামী যখন ঘরে এলেন আমার ভয় হতে লাগল পাছে তিনি সেদিনকার বক্তৃতার

দীপক রাগিণীর সঙ্গে তান না মিলিয়ে কোনো কথা বলেন, পাছে তাঁর সত্যপ্রিয়তার কোনো জায়গায় ঘা লাগাতে তিনি একটুও অসম্মতি প্রকাশ করেন -- তা হলে সেদিন আমি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা করতে পারতুম।

কিন্তু, তিনি আমাকে কোনো কথাই বললেন না। সেটাও আমাকে ভালো লাগল না। তাঁর উচিত ছিল বলা, আজ সন্দীপের কথা শুনে আমার চৈতন্য হল, এ-সব বিষয়ে আমার অনেক দিনের ভুল ভেঙে গেল। আমার কেমন মনে হল তিনি কেবল জেদ করে চুপ করে আছেন, জোর করেই উৎসাহ প্রকাশ করছেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, সন্দীপবাবু আর কতদিন এখানে আছেন ?

স্বামী বললেন, তিনি কাল সকালেই রংপুরে রওনা হবেন।

কাল সকালেই ?

হ্যাঁ, সেখানে তাঁর বক্তৃতার সময় স্থির হয়ে গেছে।

আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলুম, তার পরে বললুম, কোনোমতে কালকের দিনটা থেকে গেলে হয় না ?

সে তো সম্ভব নয়, কিন্তু কেন বলো দেখি।

আমার ইচ্ছা আমি নিজে উপস্থিত থেকে তাঁকে খাওয়াব।

শুনে আমার স্বামী আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এর পূর্বে অনেক দিন অনেকবার তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে আমাকে বের হবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। আমি কিছুতেই রাজি হই নি।

আমার স্বামী আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে এক রকম করে চাইলেন, আমি তার মানেটা ঠিক বুঝলুম না। ভিতরে হঠাৎ একটু কেমন লজ্জা বোধ হল। বললুম, না না, সে কাজ নেই।

তিনি বললেন, কেনই বা কাজ নেই ? আমি সন্দীপকে বলব, যদি কোনো রকমে সম্ভব হয় তা হলে কাল সে থেকে যাবে।

দেখলুম সম্ভব হল।

আমি সত্য কথা বলব। সেদিন আমার মনে হচ্ছিল ঈশ্বর কেন আমাকে আশ্চর্য সুন্দর করে গড়লেন না ? কারো মন হরণ করবার জন্যে যে, তা নয়। কিন্তু, রূপ যে একটা গৌরব। আজ এই মহাদিনে দেশের পুরুষেরা দেশের নারীর মধ্যে দেখুক একবার জগদ্ধাত্রীকে। কিন্তু, বাইরের রূপ না হলে তাদের চোখ যে দেবীকে দেখতে পায় না। সন্দীপবাবু কি আমার মধ্যে দেশের সেই জগ্ৰত শক্তিকে দেখতে পাবেন ? না, মনে করবেন, এ একজন সামান্য মেয়েমানুষ, তাঁর এই বন্ধুর ঘরের গৃহিণীমাত্র ? সেদিন সকালে মাথা ঘষে আমার সুদীর্ঘ এলোচুল একটি লাল রেশমের ফিতে দিয়ে নিপুণ করে জড়িয়েছিলুম। দুপুরবেলায় খাবার নিমন্ত্রণ, তাই ভিজে চুল তখন খোঁপা করে বাঁধবার সময় ছিল ন। গায়ে ছিল জরির পাড়ের একটি সাদা মাদ্রাজী শাড়ি, আর জরির একটুখানি পাড়-দেওয়া হাত-কাটা জ্যাকেট।

আমি ঠিক করেছিলুম এ খুব সংযত সাজ, এর চেয়ে সাদাসিধা আর-কিছু হতে পারে না। এমন সময় আমার মেজো জা এসে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তার পরে ঠোঁটদুটো খুব টিপে একটু হাসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, দিদি, তুমি হাসলে যে ?

তিনি বললেন, তোর সাজ দেখছি।

আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে বললুম, এমনিই কি সাজ দেখলে ?

তিনি আর-একবার একটুখানি বাঁকা হাসি হেসে বললেন, মন্দ হয় নি ছোটোরানী, বেশ হয়েছে। কেবল ভাবছি সেই তোমার বিলিতি দোকানের বুক-কাটা জামাটা পরলেই সাজটা পুরোপুরি হত। এই বলে তিনি কেবল তাঁর মুখ-চোখ নয়, তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত দেহের ভঙ্গি হাসিতে ভরে ঘর থেকে চলে গেলেন। খুব রাগ হল এবং মনে হল সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে আটপৌরে মোটাগোছের একটা শাড়ি পরি। কিন্তু, সে ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত কেন যে পালন করতে পারলুম না তা ঠিক জানি নে।

মনে মনে বললুম, আমি যদি বেশ ভদ্রকম সাজ না করেই সন্দীপবাবুর সামনে বেরোই তা হলে আমার স্বামী রাগ করবেন-- মেয়েরা যে সমাজের শ্রী।

ভেবেছিলুম, সন্দীপবাবু একেবারে খেতে যখন বসবেন তখন তাঁর সামনে বেরোব। সেই খাওয়ানো-কর্মটার আড়ালে প্রথম-দেখার সংকোচ অনেকটা কেটে যাবে। কিন্তু, খাবার তৈরি হতে আজ দেরি হচ্ছে, প্রায় একটা বেজে গেছে। তাই আমার স্বামী আলাপ করবার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ঘরে ঢুকে প্রথমটা তাঁর মুখের দিকে চাইতে ভারি লজ্জা ঠেকছিল। কোনোমতে সেটা কাটিয়ে জোর করে বলে ফেললুম, আজ খেতে আপনার দেরি হয়ে গেল।

তিনি অসংকোচে আমার পাশের চৌকিতে এসে বললেন, দেখুন, অন্ন তো রোজই একরকম জোটে, কিন্তু অন্নপূর্ণা থাকেন আড়ালে। আজ অন্নপূর্ণা এলেন, অন্ন না হয় আড়ালেই রইল।

যেমন জোর তাঁর বক্তৃতায় তেমনি ব্যবহারে। একটুও দ্বিধা নেই। সব জায়গাতেই আপন আসনটি অবিলম্বে জিতে নেওয়াই যেন তাঁর অভ্যাস। কেউ কিছু মনে করতে পারে এ-সব তর্ক তাঁর নয়। খুব কাছে এসে বসবার স্বাভাবিক দাবি যেন তাঁর আছে, অতএব এতে যে দোষ দিতে পারে দোষ তারই।

আমার লজ্জা হতে লাগল, পাছে সন্দীপবাবু মনে করেন আমি নেহাৎ একটা সেকেলে জড়পদার্থ।

মুখের কথা বেশ জ্বল জ্বল করে উঠবে, কোথাও বাধবে না, এক-একটা জবাব শুনে তিনি মনে মনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, এ আমার কিছুতেই ঘটে উঠল না। ভিতরে ভিতরে ভারি কষ্ট হতে লাগল ;

নিজেকে হাজারবার ভর্ৎসনা করে বললুম, কেন গুঁর সামনে এমন হঠাৎ বের হতে গেলুম !

কোনোরকম করে খাওয়ানোটা হয়ে গেলেই আমি তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিলুম ; তিনি আবার তেমনি নিঃসংকোচে দরজার কাছে এসে আমার পথ আগলে বললেন, আমাকে পেটুক ঠাওরাবেন না, আমি খাওয়ার লোভে এখানে আসি নি। আমার লোভ কেবল আপনি ডেকেছেন বলে। যদি খাওয়ার পরে অমনি পালান তা হলে অতিথিকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

এমন-সব কথা অত্যন্ত সহজে অত্যন্ত জোরে না বললে ভারি বদসুর লাগত। আমার স্বামী যে গুঁর পরম বন্ধু, আমি যে গুঁর ভাজের মতো। আমি যখন নিজের সঙ্গে লড়াই করে সন্দীপবাবুর প্রবল আত্মীয়তার সমোচ্চ ক্ষেত্রে ওঠবার চেষ্টা করছি, আমার স্বামী আমার বিদ্রাট দেখে আমাকে বললেন, আচ্ছা, তুমি তা হলে তোমার খাওয়া সেরে চলে এসো।

সন্দীপবাবু বললেন, কিন্তু কথা দিয়ে যান ফাঁকি দেবেন না।

আমি একটু হেসে বললুম, আমি এখনই আসছি।

তিনি বললেন, আপনাকে কেন বিশ্বাস করি নে তা বলি। আজ ন বছর হল নিখিলেশের বিয়ে হয়েছে। এই নটি বছর আপনি আমাকে ফাঁকি দিয়ে এসেছেন। আবার ফের যদি ন বছর করেন তা হলে আর দেখা হবে না।

আমিও আত্মীয়তা শুরু করে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললুম, কেন, তা হলেই বা দেখা হবে না কেন।

তিনি বললেন, আমার কুষ্ঠীতে আছে আমি অল্প বয়সে মরব। আমার বাপ দাদা কেউ ত্রিশের কোঠা পেরোতে পারেন নি। আমার তো এই সাতাশ হল।

তিনি বুঝেছিলেন কথাটা আমার মনে বাজবে। বাজলও বটে। এবার আমার মৃদুকণ্ঠে বোধ হয় করুণ রসের একটু ছিটে লাগল। আমি বললুম, সমস্ত দেশের আশীর্বাদে আপনার ফাঁড়া কেটে যাবে।

তিনি বললেন, দেশের আশীর্বাদ দেশলক্ষ্মীদের কণ্ঠ থেকেই তো পাব। সেইজন্যেই তো এত ব্যাকুল হয়ে আপনাকে আসতে বলছি, তা হলে আজ থেকেই আমার স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হবে।

স্রোতের জল ধোলা হলেও অনায়াসে তার ব্যবহার চলে। সন্দীপবাবুর সমস্তই এমনি দ্রুতবেগে সচল যে, আর-এক জনের মুখে যা সহিত না তাঁর মুখে তাতে আপত্তি করবার ফাঁক পাওয়া যায় না। হাসতে হাসতে বললেন, দেখুন, আপনার এই স্বামীকে জামিন রেখে দিলুম, আপনি যদি না আসেন তা হলে ইনিও খালাস পাবেন না।

আমি যখন চলে আসছি তিনি আবার বলে উঠলেন, আমার আর-একটু সামান্য দরকার আছে।

আমি থমকে ফিরে দাঁড়ালুম। তিনি বললেন, ভয় পাবেন না, এক গ্লাস জল। আপনি দেখেছেন আমি খাবার সময়ে জল খাই নে-- খাবার খানিক পরে খাই।

এর পরে আমাকে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করতে হল, কেন বলুন দেখি।

কবে তাঁর কঠিন অর্জীর্গরোগ হয়েছিল তার ইতিহাস এল। প্রায় সাত মাস ধরে তাঁর কিরকম অসহ্য ভোগ গিয়েছে তাও শুনলুম। অ্যালোপ্যাথ হোমিওপ্যাথ সকল রকমের চিকিৎসকের উপদ্রব পার হয়ে অবশেষে কবিরাজের চিকিৎসায় কিরকম আশ্চর্য ফল পেয়েছেন তার বর্ণনা সেরে হেসে তিনি বললেন, ভগবান আমার ব্যামোগুলোও এমনি করে গড়েছেন যে স্বদেশী বড়িটুকু হাতে-হাতে না পেলে তারা বিদায় হতে চায় না।

আমার স্বামী এতক্ষণ পরে বললেন, আর বিদেশী ওষুধের শিশিগুলোও যে একদণ্ড তোমার আশ্রয় ছাড়তে চায় না, তোমার বসবার ঘরের তিনটি শেল্ফ যে একেবারে—

ওগুলো কী জান ? পু্যানিটিভ পুলিশের মতো। প্রয়োজন আছে বলে যে এসেছে তা নয়-- আধুনিক কালের শাসনে ওরা ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে-- কেবল দণ্ডই দিতে হয়, গুঁতোও কম খাই নে।

আমার স্বামী অত্যাধিক সইতে পারেন না। কিন্তু অলংকারমাত্রই যে অত্যাধিক, সে তো বিধাতার তৈরি নয়, মানুষের বানানো। আমি একবার আমার নিজের কোনো একটা মিথ্যার জবাবদিহির ছলে আমার স্বামীকে বলেছিলাম, গাছপালা-পশুপাখিরাই আগাগোড়া সত্য বলে, বেচারাদের মিথ্যা বলবার শক্তি নেই। পশুর চেয়ে মানুষের এইখানে শ্রেষ্ঠতা, আবার পুরুষের চেয়ে মেয়েদের শ্রেষ্ঠতাও এইখানে-- মেয়েদেরই বিস্তার অলংকার সাজে এবং বিস্তার মিথ্যাও মানায়।

ঘর থেকে বাইরে এসে দেখি মেজো জা একটা জানলার খড়খড়ি একটুখানি ফাঁক করে ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এখানে যে ? তিনি ফিস্ ফিস্ করে উত্তর করলেন, আড়ি পাতছিলুম। যখন ফিরে এলুম সন্দীপবাবু করুণ স্বরে বললেন, আপনার আজ বোধ হয় কিছুই খাওয়া হল না। শুনে আমার ভারি লজ্জা হল। আমি একটু বেশি শীঘ্র ফিরে এসেছি। ভদ্ররকম খাবার জন্যে যতটা সময় দেওয়া উচিত ছিল তা দেওয়া হয় নি। আজকের আমার খাওয়ার মধ্যে না-খাওয়ার অংশটাই যে বেশি, সময়ের অঙ্ক হিসাব করলে সেটা বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু কেউ যে সেই হিসাব করছিল তা আমার মনেও হয় নি।

সন্দীপবাবু বোধ হয় আমার লজ্জাটুকু দেখতে পেলেন, সেইটেই আরো লজ্জা। তিনি বললেন, বনের হরিণীর মতো আপনার তো পালাবার দিকেই ঝাঁক ছিল, তবুও যে এত কষ্ট করে সত্য রক্ষা করলেন এ আমার কম পুরস্কার নয়।

আমি ভালো করে জবাব দিতে পারি নি, মুখ লাল করে ঘেমে একটা সোফার কোণে বসে পড়লুম। দেশের মূর্তিমতী নারীশক্তির মতো যেরকম নিঃসংকোচে এবং সগৌরবে সন্দীপবাবুর কাছে বেরিয়ে কেবলমাত্র দর্শনদানের দ্বারা তাঁর ললাটে জয়মাল্য পরাব কল্পনা করেছিলাম, এ পর্যন্ত তার কিছুই হল না।

সন্দীপবাবু ইচ্ছা করেই আমার স্বামীর সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দিলেন। তিনি জানেন, তর্কে তাঁর তীক্ষ্ণধার মনের সমস্ত উজ্জ্বলতা ঝক্ ঝক্ করে উঠতে থাকে। এর পরেও আমি বারবার দেখেছি আমি উপস্থিত থাকলেই তিনি তর্ক করবার সামান্য উপলক্ষটুকু ছাড়তেন না।

‘বন্দে মাতরম্’ মন্ত্র সম্বন্ধে আমার স্বামীর মত কী তিনি জানতেন, সেইটের উল্লেখ করে বললেন, দেশের কাজে মানুষের কল্পনাবৃত্তির যে একটা জায়গা আছে সেটা কি তুমি মান না নিখিল ? একটা জায়গা আছে মানি, কিন্তু সব জায়গাই তার তা মানি নে। দেশ-জিনিসকে আমি খুব সত্যরূপে নিজের মনে জানতে চাই এবং সকল লোককে জানাতে চাই-- এতবড়ো জিনিসের সম্বন্ধে কোনো মন-ভোলাবার জাদুমন্ত্র ব্যবহার করতে আমি ভয়ও পাই লজ্জাও বোধ করি।

তুমি যাকে মায়ামন্ত্র বলছ আমি তাকেই বলি সত্য। আমি দেশকে সত্যই দেবতা বলে মানি। আমি নরনারায়ণের উপাসক-- মানুষের মধ্যেই ভগবানের সত্যকার প্রকাশ, তেমনি দেশের মধ্যে।

এ কথা সত্য যদি সত্যই বিশ্বাস কর তবে তোমার পক্ষে এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সুতরাং এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভেদ নেই।

সে কথা সত্য কিন্তু আমার শক্তি অল্প, অতএব নিজের দেশের পূজার দ্বারাই আমি দেশনারায়ণের পূজা করি।

পূজা করতে নিষেধ করি নে, কিন্তু অন্য দেশে যে নারায়ণ আছেন তাঁর প্রতি বিদ্বেষ করে সে পূজা কেমন করে সমাধা হবে ?

বিদ্বেষও পূজার অঙ্গ। কিরাতবেশী মহাদেবের সঙ্গে লড়াই করেই অর্জুন বরলাভ করেছিলেন। আমরা এক দিক দিয়ে ভগবানকে মারব, একদিন তাতেই তিনি প্রসন্ন হবেন।

তাই যদি হয় তবে যারা দেশের ক্ষতি করছে আর যারা দেশের সেবা করছে উভয়েই তাঁর উপাসনা করছে ; তা হলে বিশেষ করে দেশভক্তি প্রচার করবার দরকার নেই।

নিজের দেশ সম্বন্ধে আলাদা কথা ; ওখানে যে হৃদয়ের মধ্যে পূজার স্পষ্ট উপদেশ আছে।

তা হলে শুধু নিজের দেশ কেন, তার চেয়ে আরো ঢের স্পষ্ট উপদেশ আছে নিজেরই সম্বন্ধে।

নিজের মধ্যে যে নরনারায়ণ আছেন তাঁর পূজার মন্ত্রটাই যে দেশ-বিদেশে সব চেয়ে বড়ো করে কানে বাজছে।

নিখিল, তুমি যে এই-সব তর্ক করছ এ কেবল বুদ্ধির শুকনো তর্ক। হৃদয় বলে একটা পদার্থ আছে তাকে কি একেবারে মানবে না ?

আমি তোমাকে সত্য বলছি সন্দীপ, দেশকে দেবতা বলিয়ে যখন তোমরা অন্যান্যকে কর্তব্য, অধর্মকে পুণ্য বলে চালাতে চাও তখন আমার হৃদয়ে লাগে বলেই আমি স্থির থাকতে পারি নে। আমি যদি নিজের স্বার্থসাধনের জন্যে চুরি করি তা হলে নিজের প্রতি আমার যে সত্য প্রেম তারই কি মূলে ঘা দিই নে ? চুরি করতে পারি নে যে তাই। সে কি বুদ্ধি আছে বলে না নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলে ? ভিতরে ভিতরে আমার রাগ হচ্ছিল। আমি আর থাকতে পারলুম না ; আমি বলে উঠলুম, ইংরেজ ফরাসী জার্মান রুশ এমন কোন্ সভ্যদেশ আছে যার ইতিহাস নিজের দেশের জন্যে চুরির ইতিহাস নয় ? সে চুরির জবাবদিহি তাদের করতে হবে, এখনো করতে হচ্ছে। ইতিহাস এখনো শেষ হয়ে যায় নি। সন্দীপবাবু বললেন, বেশ তো আমরাও তাই করব। চোরাই মালে আগে ঘরটা বোঝাই করে তার পরে ধীরে সুস্থে দীর্ঘকাল ধরে আমারও জবাবদিহি করব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে বললে এখনো তারা জবাবদিহি করছে সেটা কোথায় ?

রোম যখন নিজের পাপের জবাবদিহি করছিল তখন তা কেউ দেখতে পায় নি। তখন তার ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। বড়ো বড়ো ডাকাত-সভ্যতারও জবাবদিহির দিন কখন আসে তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু, একটা জিনিস কি দেখতে পাচ্ছ না-- ওদের পলিটিক্সের ঝুলি-ভরা মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তচরবৃত্তি, প্রেস্টিজ্‌রক্ষার লোভে ন্যায় ও সত্যকে বলিদান, এই যে-সব পাপের বোঝা নিয়ে চলেছে এর ভার কি কম ? আর, এ কি প্রতিদিন ওদের সভ্যতার বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে না ? দেশের উপরেও যারা ধর্মকে মানছে না, আমি বলছি, তারা দেশকেও মানছে না।

আমার স্বামীকে আমি কোনোদিন বাইরের লোকের সঙ্গে তর্ক করতে শুনি নি। আমার সঙ্গে তিনি তর্ক করেছেন, কিন্তু আমার প্রতি তাঁর এমন গভীর করুণা যে, আমাকে হার মানাতে তাঁর কষ্ট হত। আজ দেখলুম তাঁর অস্পষ্টচালনা।

আমার স্বামীর কথাগুলোতে কোনোমতেই আমার মন সায় দিচ্ছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল, এর উপযুক্ত উত্তর আছে, উপস্থিতমত সে আমার মনে জেগাচ্ছিল না। মুশকিল এই যে, ধর্মের দোহাই দিলে চুপ করে যেতে হয় ; এ কথা বলা শক্ত ধর্মকে অতটা দূর পর্যন্ত মানতে রাজি নই। এই তর্ক সম্বন্ধে ভালোরকম জবাব দিয়ে আমি একটা লিখব এবং সেটা সন্দীপবাবুর হাতে দেব আমার মনে এই সংকল্প ছিল। তাই আজকের কথাবার্তাগুলো ঘরে ফিরে এসেই আমি নোট করে নিয়েছি।

এক সময়ে সন্দীপবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কী বলেন ?

আমি বললুম, আমি বেশি সূক্ষ্ম যেতে চাই নে, আমি মোটা কথাই বলব। আমি মানুষ, আমার লোভ আছে, আমি দেশের জন্যে লোভ করব ; আমি কিছু চাই যা আমি কাড়ব-কুড়ব। আমার রাগ আছে, আমি দেশের জন্যে রাগ করব ; আমি কাউকে চাই যাকে কাটব-কুটব, যার উপরে আমি আমার এতদিনের অপমানের শোধ তুলব। আমার মোহ আছে, আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হব ; আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দুর্গা বলব-- যার কাছে আমি বলিদানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেব। আমি মানুষ, আমি দেবতা নই। সন্দীপবাবু চৌকি থেকে উঠে আকাশে দক্ষিণ হাত আঙ্গুল ফালন করে উঠলেন, হুরা ! হুরা ! পরক্ষণেই সংশোধন করে বললেন, বন্দে মাতরং ! মন্দে মাতরং !

আমার স্বামীর অন্তরের একটি গভীর বেদনা তাঁর মুখের উপর ছায়া ফেলে চলে গেল। তিনি খুব মৃদুস্বরে বললেন, আমিও দেবতা না, আমি মানুষ, আমি সেইজন্যেই বলছি, আমার যা-কিছু মন্দ কিছুতেই সে আমি আমার দেশকে দেব না, দেব না, দেব না।

সন্দীপবাবু বললেন, দেখো নিখিল, সত্য-জিনিসটা মেয়েদের মধ্যে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে এক হয়ে আছে। আমাদের সত্যে রঙ নেই, রস নেই, প্রাণ নেই, শুধু কেবল যুক্তি। মেয়েদের হৃদয় রক্তশতদল, তার উপরে সত্য রূপ ধরে বিরাজ করে, আমাদের তর্কের মতো তা বস্তুহীন নয়। এইজন্যে মেয়েরাই যথার্থ নিষ্ঠুর হতে জানে, পুরুষ তেমন জানে না, কেননা ধর্মবুদ্ধি পুরুষকে দুর্বল করে দেয় ; মেয়েরা সর্বনাশ করতে পারে অনায়াসে, পুরুষেও পারে, কিন্তু তাদের মনে চিন্তার দ্বিধা এসে পড়ে ; মেয়েরা ঝড়ের মতো অন্যায় করতে পারে-- সে অন্যায় ভয়ংকর সুন্দর-- পুরুষের অন্যায় কুশ্রী, কেননা তার ভিতরে ভিতরে ন্যায়বুদ্ধির পীড়া আছে। তাই আমি তোমাকে বলে রাখছি আজকের দিনে আমাদের মেয়েরাই আমাদের দেশকে বাঁচাবে। আজ আমাদের ধর্মকর্ম-বিচারবিবেকের দিন নয়, আজ আমাদের নির্বিচার নির্বিচার হয়ে নিষ্ঠুর হতে হবে, অন্যায় করতে হবে, আজ পাপকে রক্তচন্দন পরিণত করে আমাদের দেশের মেয়েদের হাতে তাকে বরণ করে নিতে হবে। আমাদের কবি কী বলেছে মনে নেই ?--

এসো পাপ, এসো সুন্দরী !

তব চুম্বন-অগ্নি-মদিরা রক্তে

ফিরুক সঞ্চরি।

অকল্যাণের বাজুক শঙ্খ,

ললাটে, লেপিয়া দাও কলঙ্ক,

নির্লাজ কালো কলুষপঙ্ক

বুকে দাও প্রলয়ংকরী !

আজ থিক্ থাক্ সেই ধর্মকে যা হাসতে হাসতে সর্বনাশ করতে জানে না।

এই বলে তিনি মেজের উপর দু-বার জোরে লাথি মারলেন--কার্পেট থেকে অনেকখানি নিদ্রিত ধুলো চমকে উপরে উঠে পড়ল। দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষ যা-কিছুকে বড়ো বলে মেনেছে এক মুহূর্তে তিনি তাকে অপমান করে এমন গৌরবে মাথা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন যে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আবার হঠাৎ গর্জে উঠলেন, যে আঙুন ঘরকে পোড়ায়, যে আঙুন বাহিরকে জ্বালায়, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি সেই আঙুনের সুন্দরী দেবতা, তুমি আজ আমাদের সকলকে নষ্ট হবার দুর্জয় তেজ দাও, আমাদের অন্যায়কে সুন্দর করো।

এই শেষ কটি কথা তিনি যে কাকে বললেন তা ঠিক বোঝা গেল না। মনে করা যেতে পারত তিনি যাকে বন্দে মাতরং বলে বন্দনা করেন তাকে, কিম্বা দেশের যে নারী সেই দেশলক্ষ্মীর প্রতিনিধিরূপে তখন সেখানে বর্তমান ছিল তাকে। মনে করা যেতে পারত কবি বাঙ্গালী যেমন পাপবুদ্ধির বিরুদ্ধে করুণার আঘাতে এক নিমেষে হঠাৎ প্রথম অনুষ্ঠাপ উচ্চারণ করেছিলেন তেমনি সন্দীপবাবুও ধর্মবুদ্ধির

বিরুদ্ধে নিস্কারণের আঘাতে এই কথাগুলি হঠাৎ বলে উঠলেন-- কিম্বা জনসাধারণের মনোহরণব্যবসায় চিরাভ্যস্ত অভিনয়কুশলতার এই একটি আশ্চর্য পরিচয় দিলেন। আরো কিছু বোধ হয় বলতেন, এমন সময়ে আমার স্বামী উঠে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, সন্দীপ, চন্দ্রনাথবাবু এসেছেন। হঠাৎ চমক ভেঙে ফিরে দেখি সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকবেন কি না ভাবছেন। অস্ত্রোন্মুখ সন্ধ্যাসূর্যের মতো তাঁর মুখের জ্যোতি নম্রতায় পরিপূর্ণ। আমাকে আমার স্বামী এসে বললেন, ইনি আমার মাস্টারমশায়। এঁর কথা অনেকবার তোমাকে বলেছি, এঁকে প্রণাম করো। আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আশীর্বাদ করলেন, মা, ভগবান চিরদিন তোমাকে রক্ষা করুন। ঠিক সেই সময়ে আমার সেই আশীর্বাদের প্রয়োজন ছিল।

পরিচ্ছেদ ২

-----www.arshi.org-----